■ (ক) ইসলামের প্রসার ও আরবদের সিন্ধু অভিযান ঃ

হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩২ খ্রীঃ) ইসলামধর্মের প্রচার শুরু করেন সপ্তম শতকের প্রথম দশকে। তিনি ঘোষণা করেন, *"ঈশ্বর (আল্লাহ) অদ্বিতীয়। তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"* ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেককেই কতকগুলি মানবিক গুণের অধিকারী হবার পরামর্শ দেন, যার অন্যতম হল—দয়া-দাক্ষিণ্য, সহমর্মিতাবোধ, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। ধর্মাচরণের জন্য ঘোষণা করেন অতি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, ব্যয়বাহুল্যবর্জিত কয়েকটি নির্দেশিকা। প্রাথমিক তীব্র বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইসলামধর্ম খুব দ্রুত মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং হজরত মহম্মদের জীবনাবসানের (৬৩২ খ্রীঃ) এক শতকের মধ্যেই ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ; এবং এই সম্প্রসারণের কাজে মূল ভুমিকা নেয় আরবদেশ।

ইসলামের জন্মভূমি আরবদেশ বিশ্বের বৃহত্তম উপদ্বীপ এবং গোলার্ধের শুষ্কতম অঞ্চল। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মিলনভূমি দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার এই উপদ্বীপটি পূর্ব গোলার্ধের কেন্দ্রভূমি হিসেবে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামধর্মের উত্থানের কালে আরবদের মোট জনসংখ্যা দেড় লক্ষের বেশি ছিল না এবং সমাজ ছিল উপজাতি-ভিত্তিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, সামাজিক জীবনে বৈষম্য ও নৈতিক অধঃপতন দ্বারা জর্জরিত। আরব ভূখণ্ডে নতুন যুগের সূর্যোদয় ঘটে ইসলামের নেতৃত্বে। আরবদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইসলামধর্মের দ্রুত প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইসলামের স্পর্শে অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবভূমি যেমন আলোকের সন্ধান পায়, তেমনি আরবভূমিকে ভিত্তি করেই ইসলামের ধর্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। হজরতের মৃত্যুর পর ইসলামের বাণী বহন করার দায়িত্ব অর্পিত হয় *'খলিফা'*র উপর। প্রথম চারজন মহান খলিফা, যথা—*আবুবকর* (৬৩২-'৩৪ খ্রীঃ), *ওমর* (৬৩৪-'৪৪ খ্রীঃ), *ওসমান* (৬৪৪-'৫৬ খ্রীঃ) এবং *আলি* (৬৫৬-'৬১ খ্রীঃ)-র নেতৃত্বে আরবদেশে একটি সুষ্ঠু ও সবল শাসন-কাঠামো গড়ে ওঠে এবং আরবের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আলির আমলে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং সিরিয়ার শাসনকর্তা মোয়াবিয়া আলিকে হত্যা করে খলিফা-পদ দখল করেন। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল খলিফাপদ 'উমায়েদ' বংশের অধীনে থাকে। এই পর্বেই আরবগণ ভারতের সিন্ধু দখল করে তাদের শাসন প্রবর্তন করে। যাই হোক্, ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সিরিয়া ও মিশর আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পারস্য আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অক্ষু নদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী

Scanned by CamScanner

অঞ্চল আরব শাসনাধীনে চলে আসে। অষ্টম শতকের মধ্যেই ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছিল অতলান্তিক মহাসাগর থেকে সিন্ধুনদ এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এবং স্পেন, পোর্তুগাল, দক্ষিণ-ফ্রান্স, উত্তর-আফ্রিকা, মিশর, আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, বালুচিস্তান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশাল আরব সাম্রাজ্য। পারস্য জয় করার পর আরবদের দৃষ্টি পড়ে পূর্বদিকে ভারত-ভূমির উপর।

○ আরবদের সিন্ধুবিজয়ের পটভূমি ও কারণ ঃ

ইসলামের বিজয়-পতাকা বাহিত হওয়ার তথ্যমূলক বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতভূমিতে তাদের প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব অনুভূত হয়। আরবী ও ফার্সীতে লেখা কিছু গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত অবশ্যই করা হয়েছে। তবে সেগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ বিষয়ে প্রধান উপাদান হল *'অল-বিলাদুরি'* নামক গ্রন্থ। এতে আরবদের ভারত-অভিযানের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত সন-তারিখের পরস্পর-বিরোধিতা কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তবে *'আল-তারি'* এবং *'খুলাসত্-উৎ-আকবর'* নামক গ্রন্থ দুটির সাহায্যে *'অল-বিলাদুরি'র* বিভ্রান্তি কিছুটা নিরসন করা যায়। সিন্ধুর রাজা *'চাচ'*-এর নামাঙ্কিত *'চাচনামা'* গ্রন্থটি আরবদের সিন্ধু অভিযান সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান। এখানে ঘটনার ধারাবাহিকতা যথার্থভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তীকালে রচিত *তারিখ-এ-সিন্ধ'* (মীর মহম্মদ মাসুদ) এবং *'তুফাতুল কিরাম'* (আলিশের কানি) গ্রন্থ দুটিও এ বিষয়ে আমাদের আলোকপাত করে।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ এবং আরবদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সপ্তম শতকে ইসলামধর্ম গ্রহণের আগেই আরবীয় বণিকেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হয়ে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। সিরাজ, হরমুজ প্রভৃতি বন্দর থেকে আগত বণিকেরা ভারতবাসীর কাছে বরণীয় ছিল, অন্তত অর্থনৈতিক কারণে। ইসলামধর্ম প্রসারের অব্যবহিত পরেও এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রকৃতিগত বা গুণগত বৈশিষ্ট্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পরে আরবদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। ইসলামধর্ম আরবদের মধ্যে একদিকে যেমন রাজনৈতিক স্থিতি ও দৃঢ়তা আনে, অন্যদিকে তাদের মনে নতুন ভূখণ্ড ও ইসলামের বাণী প্রসারের উন্মাদনার জন্ম দেয়। ইতিপূর্বে ভারতে আগত বণিকদের মাধ্যমে এদেশের ঐশ্বর্য-সম্পদের বিষয়ে তারা অবহিত হয়েছিল। এখন আপন শক্তিবলে সেই সম্পদ দখল এবং পৌত্তলিকদের ধ্বংসসাধন করে ইসলামের সম্প্রসারণ—এই অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক দ্বৈত-কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য তারা অস্ত্র-হাতে অগ্রসর হয় ভারতের বিরুদ্ধে। আরবদের ভারতভূমি দখল কর্মসূচীর প্রথম লক্ষ্য হয় সিন্ধুদেশ।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আরবদের প্রথম সামরিক অভিযান প্রেরিত হয় খলিফা ওমর-এর আমলে। ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল বোম্বাই-এর নিকটবর্তী থানা অঞ্চল। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সমুদ্রপথে এরূপ অভিযানের বিপদ-সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল বলে খলিফা এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ প্রাথমিকভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। ওমরের মৃত্যুর পর আবার আরবদের ভারত-অভিযানের কর্মসূচী গৃহীত হয়। সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে

এবং একই সাথে জলপথ ও স্থলপথে ভারতের বিরুদ্ধে তারা পর পর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করে। ৬৪৩-'৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল্লা-বিন্-অমর-বিন্-বাবি'র নেতৃত্বে আরবগণ সিস্তান দখল করে এবং মাক্‌রান (বালুচিস্তান) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে জাঠ সম্প্রদায়ের মানুষ আরবীয়দের প্রবলভাবে বাধা দেয়। ভারত-অভিযানের সমস্যা প্রসঙ্গে *আবদুল্লা* খলিফাকে এক পত্রে লেখেন ঃ *"এখানে পানীয় জলের খুব অভাব, ফলমূল নিম্নমানের, কিন্তু ডাকাতরা ভয়ঙ্কর। খুব কম সৈন্য নিয়ে অভিযানে এলে তাদের নিহত হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু বেশি সংখ্যায় এলে তাদের উপোসী থাকতে হবে।"* এমতাবস্থায় খলিফার নির্দেশে অভিযান পরিত্যক্ত হয়। এর পর ৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আল-হারি অভিযান চালিয়ে কিছুটা সাফল্য পান। কিন্তু ৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের অভিযানকালে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আল-মুহাল্লব আর একটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন। অন্যান্য কয়েকটি অভিযানে এসে আরব সেনাপতি আবদুল্লা, সিমান-বিন্-সালমা, রসিদ-বিন্-আমির, আল-মুধির প্রমুখ সাফল্য ও ব্যর্থতার মিলিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। অবশ্য সাফল্যের থেকে ব্যর্থতার ভার ছিল অনেক বেশি। অতঃপর ইরাকের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সাম্রাজ্যবাদী গভর্নর আল হজ্জাজ সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের নেতৃত্ব দেন। খলিফা ওয়ালিদ মালিকের অনুমতি ও শুভেচ্ছা পেতেও তাঁর দেরি হয়নি। সিন্ধুর রাজা দাহিরের সঙ্গে সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হজ্জাজের মতবিরোধ ঘটলে, তিনি সিন্ধুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পাঠান। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ওবেদুল্লা ও বুদাইল-এর নেতৃত্বে যে দুটি অভিযান পাঠান তা আরবদের ধারাবাহিক ব্যর্থতারই পুনরাবৃত্তি ঘটায়। যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন আরব সেনাপতিদ্বয়। ক্ষুব্ধ হজ্জাজ পরবর্তী অভিযানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। অভিযানের নেতৃত্ব দেন নিজের জামাতা সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক ইমাদ-উদ্দিন-মহম্মদ-বিন্-কাশিমকে (৭১২ খ্রীঃ)।

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু আক্রমণের এই পর্বের তাৎক্ষণিক কারণ সম্পর্কে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি মতানুযায়ী সিংহলে বসবাসকারী কয়েকজন মুসলমান বণিকের মৃত্যুর পর সিংহল-রাজ মৃত বণিকদের কন্যাদের একটি জাহাজে করে খলিফার পূর্ব সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা হজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু সিন্ধুর উপকূলে জলদস্যুরা ওই জাহাজগুলি লুঠ করে। অন্য একটি মতে, সিংহলের রাজা স্বয়ং ইসলামধর্ম গ্রহণ করে খলিফার উদ্দেশ্যে কিছু উপঢৌকন একটি জাহাজে প্রেরণ করেন। সিন্ধুর উপকূলে জাহাজটি লুণ্ঠিত হয়। ডঃ *ঈশ্বরীপ্রসাদ* সিংহলের রাজার ইসলাম-গ্রহণ তত্ত্বটিকে 'সম্পূর্ণ অবাস্তব, ও অসম্ভব ও ভ্রান্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় মতানুসারে, খলিফা ওয়ালিদ-এর পিতা আব্দুল মালিক ভারত থেকে কিছু মহিলা ক্রীতদাস ও দ্রব্যসংগ্রহের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদল সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাদের মালপত্র লুণ্ঠিত হয়। তিনটি বিবরণীর মূলকথা হল খলিফার প্রাপ্য কিছু জিনিস সিন্ধুর বন্দরে লুণ্ঠিত হয়েছিল। এই ঘটনায় হজ্জাজ প্রচণ্ড মর্মাহত হন এবং এই কাজের জন্য সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু দাহির এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং ক্ষতিপূরণ দিতে অসম্মত হন। অতঃপর ক্ষুব্ধ হজ্জাজ খলিফার অনুমতিক্রমে সিন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান।

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক *ওলসি হেগ 'জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠন-তত্ত্ব'টিকেই* আরবদের সিন্ধু অভিযানের (৭১২ খ্রীঃ) মুখ্য কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু ভারতীয় বহু ঐতিহাসিক মনে

Scanned by CamScanner

করেন, এটি ছিল অন্যতম এবং প্রত্যক্ষ কারণ, কিন্তু একমাত্র বা মূল কারণ নয়। ঐতিহাসিক *শ্রীবাস্তব* (A. L. Srivastava) মনে করেন, আরবদের সিন্ধু-আক্রমণের পশ্চাতে গভীর রাজনৈতিক ও ভৌমিক আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ভারতীয় ধনসম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা। ইতিপূর্বেই ভারতের ঐশ্বর্য সম্পর্কে তারা অবহিত হয়েছিল। এখন সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা পূরণের শর্ত ও সঙ্গী হিসেবে ভারতের অতুল সম্পদ তাদের আক্রমণ-স্পৃহাকে প্রবলতর করেছিল। তবে আরবদের সিন্ধু-আক্রমণের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মীয় প্রেরণা। *শ্রীবাস্তবের* ভাষায় ঃ *".....the principal driving force was the religious zeal which made them feel and act as if God was using them as agents for the propagation of Islam and the uprooting of infidel fiath...."* আরবরা যে সকল অঞ্চল দখল করেছে, সেখানে কেবল ইসলামধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি ; সেইসব অঞ্চলের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছে। সিন্ধু-আক্রমণের ক্ষেত্রেও এই মানসিকতা বজায় ছিল। তাই দেবল বন্দরে জাহাজ লুণ্ঠনের ঘটনাটি ছিল তাদের সিন্ধু-আক্রমণের তাৎক্ষণিক কারণ বা অজুহাত মাত্র।

মহম্মদ-বিন্-কাশিম প্রায় পনেরো হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীসহ সিন্ধু অভিমুখে রওনা হন। মাকরানে তিনি উপস্থিত হলে সেখানকার শাসক মহম্মদ হারুন তাঁর বাহিনীসহ কাশিমের সাথে অগ্রসর হন। আব্দুল আসাদ জাহানের নেতৃত্বে সাহায্যকারী আরও একটি আরবীয়-বাহিনী সিন্ধুর উপকূলে কাশিমের সাথে যোগ দেয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সিন্ধু-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে মহম্মদ-বিন্-কাশিম দেবলে উপস্থিত হন। সিন্ধুর রাজা দাহির তাঁর অদূরদর্শিতার বা আলস্যের জন্যই হোক্, কিংবা তাঁর গুপ্তচরবাহিনীর অপদার্থতার জন্যই হোক্, আরবীয়দের এই আক্রমণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং দেবল রক্ষা করার কোন উদ্যোগ ছাড়াই রাজধানী আলোরে (বা আরোর) বসে থাকেন। মহম্মদ কাশিম মাত্র ৪ হাজার রক্ষীর দুর্বল প্রতিরোধ ভেঙে খুব সহজেই দেবল দখল করে নেন। রক্ষীরা আপ্রাণ বাধা দেয়, কিন্তু আরববাহিনীর সংখ্যাধিক্য এবং জনৈক ব্রাহ্মণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দেবল নগরীর পতন ঘটে। মুসলমানরা নির্বিচারে হত্যা, লুঠতরাজ ও ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালায়। সতেরো বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত পুরুষকে হত্যা করা হয়। নারী ও শিশুদের পরিণত করা হয় দাসে। লুণ্ঠিত অর্থের এক-পঞ্চমাংশ হজ্জাজ মারফত উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত হয় খলিফার কাছে। এইভাবে দীর্ঘ ব্যর্থতার পর আরবগণ সিন্ধুর বিরুদ্ধে প্রবল সামরিক সাফল্য অর্জন করে। এবং এই সাফল্যের জন্য আরবীয়দের দক্ষতা যতটা না দায়ী ছিল, তার থেকে অনেক বেশি দায়ী ছিল রাজা দাহিরের অপদার্থতা। *শ্রীবাস্তব লিখেছেন ঃ Thus did the first important town of India fall in to the hands of the Arabs not due to any cowardice on the part of the Indian soliders, but owing to the lethargy of an Indian ruler."*

দেবলে একজন আরবীয় শাসক নিযুক্ত করে মহম্মদ-বিন্-কাশিম দেবলের উত্তর-পূর্বে নিরুণ শহরের দিকে অগ্রসর হন। নিরুণের অধিবাসীরা, যাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ এবং রাজা দাহিরের উপর বীতশ্রদ্ধ, বিনা প্রতিরোধে আরবদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর মহম্মদ-বিন্-কাশিম সিন্ধুর উপনদী মিরান অতিক্রম করে ব্রাহ্মণাবাদে অবস্থানকারী রাজা দাহিরের মুখোমুখি হওয়ার উদ্যোগ নেন। রাজা দাহির আর কাল বিলম্ব না করে আরব বাহিনীকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশাল হস্তী-বাহিনীসহ রাজা দাহির স্বয়ং যুদ্ধে অংশ নেন। ইতিপূর্বে দেবলে আক্রমণকারীদের বাধা না-দিয়ে দাহির একটি ভুল করেছিলেন ; কিন্তু এখন স্বয়ং যুদ্ধে অংশ নিয়ে আর একটা মহাভুল করলেন। কারণ রাজা হিসেবে নিরাপদ শিবিরে থেকে সৈন্যদের নির্দেশ দিলেই তিনি ভাল করতেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান সৈন্যর আঘাতে তাঁর পতন ঘটার ফলে সমগ্র সিন্ধু-বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। দাহিরের মৃত্যুর পরেও তাঁর পত্নী রানীবাঈ এবং রাওর দুর্গের অন্যান্য অধিবাসীরা প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। কিন্তু আরবদের তীব্র আক্রমণের সামনে দাঁড়ানো তাঁদের পক্ষে ছিল নিতান্তই অসম্ভব। তাই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মহিলারা নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করেন। রাওর দুর্গের পতনের পর আরবীয়-বাহিনী ব্রাহ্মণাবাদ আক্রমণ করে। দাহিরের অন্যতম পুত্র জয়সিংহ কিছু বাধাদানের পর সাফল্য অসম্ভব বুঝতে পেরে চিতোরে পালিয়ে যান। এখানেও বহু মানুষ নিহত হন এবং লুণ্ঠিত হয় বহু ধনসম্পদ। এখান থেকেই মহম্মদ-বিন্-কাশিম দাহিরের অপর স্ত্রী রানী লাদি এবং দুই কন্যা সূর্যদেবী ও পরমলদেবীকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর কাশিম সিন্ধুর রাজধানী আরোর এবং মুলতান দখল করেন এবং কনৌজের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার মুহূর্তে খলিফা ওয়ালিদ মহম্মদ-বিন্-কাশিমের প্রাণদণ্ড দেন।

অভাবনীয় সাফল্য দ্বারা খলিফার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করার পরেও মহম্মদ-বিন্-কাশিমের আকস্মিক প্রাণদণ্ডাদেশ কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক। এ-সম্পর্কে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়। প্রথম কারণটি রোমাঞ্চকর। মহম্মদ-বিন্-কাশিম দাহিরের কন্যাদ্বয় সূর্যদেবী ও পরমলদেবীকে বন্দি করে খলিফার কাছে পাঠিয়েছিলেন। পিতার হত্যাকারীকে চরম শাস্তি দেবার বাসনায় এঁরা খলিফার কাছে নালিশ করেন যে, মহম্মদ কাশিম তাঁদের মর্যাদা হানি করার পরে খলিফার কাছে পাঠিয়েছেন। এহেন ধৃষ্টতার সংবাদে ক্রুদ্ধ খলিফা ওয়ালিদ তৎক্ষণাৎ মহম্মদ-বিন্-কাশিমের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন এবং তা কার্যকর করা হয়। অবশ্য কাশিমের প্রাণহীন দেহ দেখার পর দাহিদের কন্যারা স্বীকার করেন যে, তাঁদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যমূলক। খলিফা অতঃপর এঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, এই কাহিনীটি অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত। এঁদের মতে, কাশিমের মৃত্যুদণ্ড ছিল আরবের রাজনৈতিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বের পরিণতি মাত্র। খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুর (৭১৪ খ্রীঃ) পর খলিফা হন তাঁর ভাই সুলেমান। নতুন খলিফা ছিলেন হজ্জাজের ঘোর শত্রু। তাই ক্ষমতা দখল করার পর তিনি হজ্জাজের জ্ঞাতিভাই তথা জামাতা মহম্মদ-বিন্-কাশিমকে পদচ্যুত করেন এবং বন্দিরূপে মেসোপটেমিয়ায় এনে নৃশংসভাবে হত্যা করেন (৭১৫ বা ৭১৬ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিক *শ্রীবাস্তব* মনে করেন, দ্বিতীয় কারণটিই বেশি নির্ভরযোগ্য। তাঁর ভাষায় ঃ *"The other account which ascribes Muhammad's death of political reasons, is more worthy of credence."*

মহম্মদ-বিন্-কাশিমের সামরিক ও প্রশাসনিক প্রতিভা সিন্ধুদেশে আরবীয়দের যে প্রাধান্যের সূচনা করেছিল ; তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবক্ষয়ের ছাপ দৃষ্ট হয়। মহম্মদ কাশিমের স্থলাভিষিক্ত

Scanned by CamScanner

এজিদ, হাবিব, জুনাইদ প্রমুখ প্রত্যেকেই ছিলেন অসম্পূর্ণ প্রশাসক। আরবীয় রাজনীতির পট পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে এঁরা কেউই সিন্ধুর বাস্তব পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ওমায়িদ বংশের পতন ঘটিয়ে আব্বাসিদ বংশ খলিফাপদ দখল করে সিন্ধুর শাসক পরিবর্তন করলে এখানেও গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। মুসলমানদের অন্তর্বিরোধ এবং ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতাদখলের নতুন উদ্যোগ সিন্ধুদেশে আরবীয় শাসনের দুর্বল ভিত্তিকে দুর্বলতর করে দেয়। সিন্ধুতে খলিফার কর্তৃত্ব প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায় এবং সিন্ধুর শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেন।

○ আরবদের সাফল্যের কারণ ঃ

আরব-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিলম্ব হলেও রাজা দাহিরের প্রতিরোধ ছিল যথেষ্ট তীব্র। বীরের মতই যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য সঙ্গীসহ তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এমনকি রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী রানীবাঈ অসম সাহসিকতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়ে রাওর দুর্গ থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই বিজয়ী হয়। আরবদের এই সাফল্যে ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ বা সুদূরপ্রসারী কোন পরিবর্তন হয়ত ঘটাতে পারেনি, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তুর্কী আক্রমণকারীদের সাফল্যের প্রেক্ষাপট বিচারের দিক থেকে আরব-বাহিনীর এই সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ।

মহম্মদ-বিন্-কাশিমের দক্ষ নেতৃত্ব এবং মুসলমানদের উন্নত সামরিক কৌশল অবশ্যই তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল। মুসলমানদের দ্রুতগামী অশ্বারোহী-বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সাম্যবোধ ও ধর্মীয় প্রেরণা তাদের প্রায় অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। কিন্তু কেবল ক্ষাত্রশক্তির তারতম্য একটা দীর্ঘস্থায়ী সমাজ ও রাজনীতির পতন ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই ব্যর্থতা ও পতনের জন্য তার অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধুর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিও এজন্য কম দায়ী ছিল না। রাজা দাহিরের পিতা চাচ্ অন্যায়ভাবে সিন্ধুর ক্ষমতা দখল করেছিলেন বলে এই বংশের প্রতি সাধারণ মানুষের আন্তরিক সমর্থন ছিল না। তাই দাহিরের সিন্ধুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আক্রমণ সাধারণ মানুষকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। পরন্তু সামাজিক শ্রেণীভেদ ও বৈষম্য এবং রাজশক্তি কর্তৃক তাকে সমর্থন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে রাজতন্ত্রের বিরোধীতে পরিণত করেছিল। জাঠ, মেড এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হত। উচ্চশ্রেণীর মানুষের সাথে এইসব নিম্নশ্রেণীর মানুষের বিভেদ ও বৈষম্য সামাজিক সংহতি ব্যাহত করেছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল হিন্দুরা। এর পরে ছিল বৌদ্ধ ও জৈনরা। স্বভাবতই ধর্মের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ঐক্যবদ্ধ প্রেরণা-সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাঠ ও মেড জাতিভুক্ত মানুষেরা সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজা দাহিরের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এইসব গোষ্ঠী আরব-আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজা দাহিরকে সাহায্য ত করেইনি ; পরন্তু, আক্রমণকারীদের সাথে গোপন সমঝোতা দ্বারা দাহিরের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। *'চাচনামা'* গ্রন্থে এই সকল ব্যক্তিকে *'জাতীয়তাবাদীচেতনা-বঞ্চিত বিশ্বাসঘাতক'* অভিহিত করে

বলা হয়েছে *"The Buddhist fifth-columnists welcomed the Arabs and entered into a pact with them against their own governor of Schwan)"* / অবশ্য একথা সত্য নয় যে, সমস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ দাহিরের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আবার এটাও সত্য যে, অনেক অ-বৌদ্ধ ভারতীয় মুসলিম আক্রমণকারীদের সাথে যোগ দিয়ে তাদের সাফল্য ত্বরান্বিত করেছিল। প্রকৃত সত্য এই যে, উপরোক্ত বিবরণ তৎকালীন সিন্ধুদেশের তথা ভারতের সামাজিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার একটা ছবি তুলে ধরে, যা ভারতীয়দের রাজনৈতিক পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। চাঁদ বরদৈ রচিত *'পৃথ্বীরাজ রসোঃ'* গ্রন্থের বিবরণও এই মতকে সমর্থন করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সিন্ধুদেশ ছিল অনুর্বর। স্বভাবতঃই বিশাল সেনাবাহিনী বা অতি উন্নত যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা সিন্ধুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আক্রমণকারী সেনাদের সংখ্যাধিক্য অবশ্যই তাদের সাফল্যের একটা কারণ ছিল। তবে সাহসিকতার দিক থেকে সিন্ধুর বাহিনীকে পশ্চাৎপদ বলা চলে না। কিন্তু শুধুমাত্র সাহসিকতাকে ভর করে আরবদের মত শক্তিশালী আক্রমণকারীর গতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। সিন্ধুদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই ভারতের অবশিষ্ট অংশ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিল। এমনিতেই ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ভঙ্গুর ও আত্মধ্বংসী। কোন কেন্দ্রীয় শাসনের অস্তিত্ব ছিল না। সেই সঙ্গে সিন্ধুদেশের একক অস্তিত্ব তাকে ভারতীয় মৈত্রী বা সাহায্যলাভে বঞ্চিত করেছিল নিদারুণভাবে। ব্যক্তিগতভাবে রাজা দাহিরের অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতা মুসলমানদের সাফল্যকে সহজলভ্য করেছিল। রাজ্যবিস্তারে আগ্রহী এবং শক্তিশালী আরবগণ সিন্ধুর সীমান্ত অঞ্চলে মাকরান পর্যন্ত অগ্রসর হবার পরেও দাহির নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সামান্যতম চিন্তিত হয়নি। একজন রাজার বুদ্ধি-বিবেচনার এই দৈন্য সত্যই কষ্টদায়ক। শুধু তাই নয়, মুসলমান-বাহিনী যখন সিন্ধুর একের পর এক অঞ্চল দখল করছে, বিজয়োল্লাস করছে, নির্বিচার হত্যা ও লুণ্ঠন চালাচ্ছে, তখনও দাহির ব্রাহ্মণাবাদে বসে অলসভাবে চিন্তা করছেন কখন, কিভাবে তাঁর আক্রমণে যাওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি আক্রমণকারীদের মুখোমুখি হলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একের পর এক পরাজয়ের ফলে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে ভারতীয়-বাহিনীর মনোবল এবং একই কারণে আক্রমণকারীদের মনোবল তখন তুঙ্গে। *('as the Arabs, on account of their repeated success, were flushed with enthusiasm and our people, proportionately, dispirited and demoralised for the same reasons.'—A. L. Srivastava.')*।

○ আরবীয় শাসনব্যবস্থা ও প্রকৃতি ঃ

মহম্মদ-বিন্-কাশিম যে নিছক লুণ্ঠনকারী ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশে তাঁর যুদ্ধবিজয়ের পরবর্তী কর্মধারা থেকে। সিন্ধুদেশে প্রবেশ করে এক-একটি নগর বা অঞ্চল দখল করার পরেই তিনি সেখানে আরবীয় শাসন নিযুক্ত করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য মোতায়েন করেন। তবে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর চিন্তাধারা ছিল একজন গোঁড়া ধর্মপ্রচারক ও সম্পদ সংগ্রাহকের। এই পর্বে মহম্মদ-বিন্-কাশিম প্রশাসনিক পদে কেবলমাত্র আরবীয়দের নিযুক্ত করেন। এবং বিজিত অঞ্চলে লুঠতরাজ ও পরাজিতদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার কাজকেই তাঁর প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ

Scanned by CamScanner

করেন। তাঁর প্রভু হজ্জাজ ছিলেন প্রচণ্ড গোঁড়া। স্বভাবতঃই তাঁর নির্দেশে কাশিম নির্বিচারে লুণ্ঠন ও ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু এই যুদ্ধে রাজা দাহিরের পরাজয় ও মৃত্যুর পরে সমগ্র সিন্ধুদেশ আরব-বাহিনীর করতলগত হলে, এখানে স্থায়ী ও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না। কারণ আরবরা সংখ্যায় ছিল খুব কম। অধিকাংশই যোদ্ধা। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা তাদের ছিল না। ভারতের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, ভাষা, রাজস্বব্যবস্থা ও আইনকানুন ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণকারী ও ধর্মনাশকারী বিধর্মী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আরবদের সাথে অসহযোগিতা না-করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। বস্তুত, আরব-বাহিনীর অনুপ্রবেশকাল থেকে তাদের কার্যকলাপ এই বিরূপতা তৈরি করার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। এমতাবস্থায় মহম্মদ-বিন্-কাশিম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হেজ্জাজ ও সিন্ধুর অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কাশিমকে নমনীয় ও বাস্তববাদী নীতি গ্রহণের অনুমতি দেন। *'বিনা প্রশ্নে ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ'*—হিন্দুদের প্রতি এই নীতির আক্ষরিক প্রয়োগের পরিবর্তে তিনি কিছুটা সামঞ্জস্যবিধান নীতি গ্রহণ করেন। নিয়মিত *'জিজিয়া কর'* প্রদানের পরিবর্তে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ও ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের (জিম্মি) মত নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার দেওয়া হয়। মহম্মদ-বিন্-কাশিম মুলতানে ঘোষণা করেন ঃ *'খ্রীষ্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের ধর্মসভা ও পারসিক পুরোহিতদের পূজাবেদীর মত হিন্দুদের মন্দিরও পবিত্র থাকবে।' স্যার* উইলিয়াম মুর (W. Muir)-এর মতে, এই ব্যবস্থা ইসলামের রাজনীতিতে একটি নতুন ধারার সূচনা করে। কারণ এতদিন পর্যন্ত আল-কিতাবী হিসেবে স্বীকৃত হিব্রু বা খ্রীষ্টানগণ ব্যতীত কাউকে জিজিয়া প্রদানের পরিবর্তে ধর্মানুসরণের স্বাধীনতা দেওয়া হত না। সিন্ধুদেশে কাশিম প্রবর্তিত এই সমঝোতা পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের পথ দেখিয়েছে বলেও স্যার মুর মনে করেন। *ঐতিহাসিক শ্রীবাস্তবও* এই মন্তব্যের সাথে একমত। তবে তিনি মনে করেন, মুসলমানদের এই আংশিক ধর্মসহিষ্ণুতা তাদের মনে উদারতার ফসল নয়। একটা দেশের সমস্ত মানুষকে ধর্মান্তরিত করা অসম্ভব ও অবাস্তব জেনে তারা এহেন মধ্যপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিল। যাই হোক, এই ব্যবস্থায় মহম্মদ-কাশিম সিন্ধুর হিন্দুদের সহযোগিতা অর্জনে সক্ষম হন এবং তাদের সাহায্যে সিন্ধুদেশে একটি কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সিন্ধুর বিজিত ভূখণ্ডকে কয়েকটি জেলায় (ইক্‌তা) বিভক্ত করা হয় এবং সরকারের প্রয়োজনে সামরিক সেবা প্রদানের শর্তে প্রতিটি জেলার শাসনভার একজন করে আরবদেশীয় সামরিক অফিসারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। জেলার নিম্নস্তরের প্রশাসনিক দায়িত্ব হিন্দু কর্মচারীদের হাতে থাকে। সৈন্যদের নগদ বেতনের পরিবর্তে অনেককেই 'জায়গির' জমি দেওয়া হয়। মুসলমান সন্ত এবং ইমামরাও দান হিসেবে জমি ভোগ করার সুযোগ পান। এই ব্যবস্থার ফলে সিন্ধুদেশে বেশ কয়েকটি আরবীয় সামরিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় শাসন-দায়িত্ব আগের মতই স্থানীয় মানুষের হাতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে আইন-কানুনও অপরিবর্তিত থাকে। কিছু নতুন আইন রচিত হয় মূলত শহরাঞ্চলের জন্য।

আরবদের শাসনে সিন্ধুর করব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। সরকারী আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব এবং 'জিজিয়া'। উৎপন্ন ফসলের দুই-পঞ্চমাংশ বা এক-চতুর্থাংশ হিসেবে সংগ্রহ করা হত। এছাড়া নিলামের মাধ্যমে কিছু কিছু এককালীন কর আদায় করা হত। 'জিজিয়া' ছিল একপ্রকার ধর্মকর, যা অ-মুসলমানদের প্রদান করতে হত। প্রত্যেকের আয়ের ভিত্তিতে তার প্রদেয় 'জিজিয়া'র পরিমাণ নির্ধারণ করা হত। জিজিয়া নির্ধারণের জন্য অ-মুসলমানদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তথাকথিত ধনীদের মাথাপিছু জিজিয়ার হার ছিল ৪৮ দিরহাম। মধ্যআয়ী ব্যক্তিদের দিতে হত ২৪ দিরহাম করে। এবং নিম্ন আয়কারীদের প্রদেয় জিজিয়ার হার ছিল মাথাপিছু ১২ দিরহাম। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শারীরিকভাবে অক্ষম, অন্ধ, কর্মহীন প্রমুখকে জিজিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। আরবদের আমলে বিচারব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলায় ভরা। বিচারালয়ের সুনির্দিষ্ট স্তরবিন্যাস ছিল না। জেলা-আধিকারিক বা অভিজাতগণ নিজ নিজ এলাকার বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। নির্দিষ্ট বা লিপিবদ্ধ কোন আইন নয়, বিচারকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারাই শাস্তি নিরূপিত হত। স্বভাবতঃই হিন্দুদের উপর শাস্তির বোঝাটা ছিল অনেক বেশি। সামান্য চুরির অপরাধে কোন কোন হিন্দুকে চরমভাবে নির্যাতন করা কিংবা তার স্ত্রী-পুত্রদের পুড়িয়ে হত্যা করার ঘটনার অভাব ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান-এর মধ্যে কোন বিরোধ ঘটলে কাজী কোরানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিচার করতেন। অবশ্য হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ স্থানীয় পঞ্চায়েত ফয়সালা করতে পারতেন। তবে পরবর্তীকালে আগত তুর্কীদের তুলনায় আরবদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল অনেক কম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'জিজিয়া' কর প্রদানের বিনিময়ে হিন্দুরা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী ছিল। অধুনা কোন কোন গবেষক মনে করেন, 'জিজিয়া'-কে নিছক ধর্ম-কর না বলে 'সামরিক বৃত্তি-রেহাই-কর' বলা ভাল। কারণ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুযায়ী একজন মুসলমান রাষ্ট্রকে সর্বদা সামরিক সেবা দিতে বাধ্য ছিল, কিন্তু অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই সামরিক সেবা বাধ্যতামূলক ছিল না। তাই তাদের 'জিজিয়া' কর দিতে হত। কিন্তু ঐতিহাসিক *শ্রীবাস্তব* এই ব্যাখ্যাকে 'ভ্রান্তিমূলক' মনে করেন। কারণ যে সকল হিন্দু সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করত, তাদেরও 'জিজিয়া' দিতে হত। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কোন চেষ্টা আরবদের শাসনব্যবস্থায় ছিল না। রাজা দাহিরের আমলে জাঠ, মেড প্রভৃতি নিচুতলার মানুষ যে অভাব ও অমর্যাদার সাথে বসবাস করত, আরবদের শাসনকালেও তা অপরিবর্তিতই ছিল।

○ আরব শাসনের স্বল্প স্থায়িত্বের কারণ ঃ

খলিফার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসেবে সিন্ধুদেশ টিকে ছিল মাত্র দেড়শো বছর। তার পরেও সিন্ধুতে আরবদের শাসন অব্যাহত ছিল প্রায় দেড়শো বছর ; কিন্তু এটি ছিল নিছক শব্দবর্ণহীন একটি মৃতপ্রায় অধ্যায় মাত্র। ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুর শাসকদের সাথে খলিফার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং মূলতান ও মনসুরা'কে কেন্দ্র করে দুজন আরব শাসক প্রায় স্বাধীন শাসন চালাতে থাকেন। তুর্কীদের আগমনের আগেই আরবদের অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে যায়। যে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আরবগণ সিন্ধু দখল করেছিল, তার এহেন স্বল্পস্থায়ী ও গুরুত্বহীন পরিণতি বিস্ময়কর। সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতভূমিতে আরবদের এই ব্যর্থতার অনেকগুলি কারণ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। **প্রথমত,** সিন্ধুবিজয়ী আরবদের ভারতব্যাপী কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল না। তারা সিন্ধুকে ভারত-বিজয়ের ভিত্তিকেন্দ্র রূপে

Scanned by CamScanner

ব্যবহার করার পরিবর্তে অবশিষ্ট ভারত-জীবন থেকে সিন্ধুদেশকে বিচ্ছিন্ন রেখেই সন্তুষ্ট ছিল। ইতিপূর্বেই আরবদের সাথে ব্যাপক বাণিজ্যের সূত্রে সিন্ধুপ্রদেশ বহির্ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সাথে অধিক সম্পর্কিত ছিল। রাজস্থানের মরুভূমির ওপারে হিন্দু-জগৎ থেকে এটি ছিল বিচ্ছিন্ন। আরবগণ সিন্ধুর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পরেও ভারতের রাজনৈতিক জীবনের মূল স্রোতের সাথে সিন্ধুর যোগ ঘটানোর কোন উদ্যোগ নেয়নি। *দ্বিতীয়ত*, আরবদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা সিন্ধুতে তাদের রাজনৈতিক সম্ভাবনা নষ্ট করেছিল। ওমায়িদ বংশের সাথে আব্বাসিদ বংশের বিরোধ ও ক্ষমতাদখলের লড়াই, সিন্ধুর আরব শাসকদের স্বাধীনতা-স্পৃহা বৃদ্ধি করেছিল। তাছাড়া সিন্ধু-বিজয়ের প্রথম পর্বে খলিফার উদার হাতে আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খলিফার দরবারে এ সত্য প্রকাশ পায় যে, সিন্ধু একটি অনুর্বর দেশ এবং সেখান থেকে প্রচুর রাজস্ব লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে খলিফার দপ্তর সিন্ধুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। ঘন ঘন ভূমিকম্প এবং মাঝে মাঝে সিন্ধুনদীর গতিপথ পরিবর্তনের ঘটনা এই ধারণাকে আরও জোরদার করে। *তৃতীয়ত*, আরব-আক্রমণকারীরা যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ঐক্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণে নেমেছিল, সিন্ধু-বিজয়ের পর তা দ্রুত অন্তর্হিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের সুখ তাদের অলস ও উদ্যোগহীন করেছিল। ইতিমধ্যে খলিফা হারুণ-অল্-রশিদ-এর আমলে (৭৮৬-৮০৮ খ্রীঃ) বাগদাদের নৈতিক জীবনেও ইসলামের ত্যাগ, সংগ্রাম ও ভালবাসার মূল সত্যের পরিবর্তে বিলাস ও দার্শনিক সুখবাদের প্রাবল্য ঘটেছিল। এই প্রভাব পড়েছিল সিন্ধুতেও। স্বভাবতঃই সামরিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরব-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ আর সম্ভব ছিল না। *চতুর্থত*, হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষের সাথে আরবদের হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। সিন্ধুবাসীদের কাছে আরবগণ নিছক আক্রমণকারী হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে সমগ্র হিন্দুসমাজের মনে যে গোপন প্রতিরোধ-বাসনা গড়ে উঠেছিল, আরব শাসনের অস্থায়িত্বের জন্য তার দায়িত্ব কম নয়। ***শ্রীবাস্তব*** লিখেছেন ঃ *"The generality of the Hindus, under the influence of the priestly class, considered themselves and their culture superior that of the Arabs, who were, in their eyes, nothing more than unclean barbarians."* *পঞ্চমত*, পূর্ব ও উত্তর ভারতের পরাক্রান্ত রাজপুত শক্তিগুলির, বিশেষত গুর্জর-প্রতিহার বংশের উপস্থিতি আরবদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছিল। অনেকেই মনে করেন, রাজপুতদের সামরিক পরাক্রমের কাছে আরবদের অবস্থান ছিল দুর্বল। এ ছাড়া মহম্মদ-বিন্-কাশিমের মত দক্ষ ও বিচক্ষণ নেতার অভাব, সিন্ধুর ভৌগোলিক অবস্থিতি, আধুনিক তুর্কী শক্তির উত্থানের ফলে খলিফার ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি একাধিক কারণের সমন্বয়ে আরবদের উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘায়িত হতে পারেনি।

○ সিন্ধুদেশে আরব শাসনের গুরুত্ব ঃ

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ বিজয় ও তিনশত বৎসর স্থায়ী শাসনব্যবস্থা কোন স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী ফল দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল না। ***স্ট্যান্‌লী লেন্‌পুল (S. Lanepool)*** আরবদের সিন্ধুবিজয়কে "ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান, একটি নিষ্ফল বিজয়" *("merely an episode in the history of India and Islam, a triumph without results")* বলে গণ্য করেছেন। মূলগতভাবে এই বক্তব্যের সাথে অধিকাংশ পণ্ডিতই একমত। অধ্যাপক ***শ্রীবাস্তব*** *(A. L. Srivastava)* এই বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্বহীনতা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ *"From the political point of view the Arab conquest of Sind was an insignificant event in the history of Island and also in that of India."* ***স্যার ওলসি হেইগ (W. Haig)***-এর মতে, *"সিন্ধুতে আরবদের অধিষ্ঠান ছিল একটি সামান্য উপাখ্যান এবং একটি বিরাট দেশের অতি ক্ষুদ্রতম অংশে তাদের স্বল্পস্থায়ী কর্মকাণ্ড সীমিত ছিল।"* অধ্যাপক ***হাবিবুল্লাহ*** এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, *"ভারতে ইসলামকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আরবরা অগ্রসর হয়নি। বিশাল এই ভারত মহাদেশের একপ্রান্তকে তাদের আক্রমণ নাড়া দিতে পেরেছিল মাত্র ; এবং তাও মিলিয়ে গিয়েছিল স্বল্পকালের মধ্যেই।"*

সিন্ধুদেশে আরবদের অভিযান এবং তার দুঃখজনক পরিণতি উপরিলিখিত মন্তব্যগুলির যথার্থতা প্রমাণ করে। আশ্চর্যজনক হলেও এটাই সত্য যে, স্বল্পকালের মধ্যে একাধিক মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় যে আরবদেশের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, ভারতবর্ষে তারা ছিল অনেক নিষ্প্রভ। ভারতের রাজনৈতিক জীবনের মূল ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন সিন্ধুদেশের ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। স্বভাবতঃই বিশাল ভারত-ভূখণ্ডের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে তাঁদের উপস্থিতি অনুভূত হয়নি, আর তাকে প্রভাবিত করার প্রশ্ন ত অবান্তর। এই সত্য আরও দৃঢ় হয় যখন লক্ষ্য করা যায় যে, সিন্ধু থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য ভারতীয় শক্তিগুলি আদৌ কোন সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। এমনকি আরববাহিনীর এহেন সাফল্যলাভের ঘটনা থেকে ভবিষ্যতের বৃহত্তর ও ব্যাপক কোন আক্রমণের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য সীমান্ত সুরক্ষা বা ঐক্যবদ্ধ থাকার শিক্ষাও ভারতীয় রাজন্যবর্গ গ্রহণ করেননি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরবগণ কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাননি। অনুর্বর সিন্ধুর অর্থনীতিকে সবল করার কোন চেষ্টাও তারা করেনি। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে আরবদেশ যথেষ্ট অগ্রণী ছিল। ইসলামধর্ম প্রসারের কাজেও তারা ছিল ব্যর্থ। 'জিজিয়া' কর প্রদানের বিনিময়ে অধিকাংশ ভারতবাসী তাদের স্বধর্মে দৃঢ় ছিল। হিন্দুদের কাছে আরবগণ ছিল 'বর্বর আক্রমণকারী' মাত্র। তাই আরবদের সাথে তারা কখনও একাত্ম হতে পারেনি। আর আরব-শাসকরাও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার কারণে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে নিষ্ফল হলেও ; সিন্ধুদেশে আরব-শাসনের কিছু পরোক্ষ ফল লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই ঘটনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ***শ্রীবাস্তব*** মনে করেন, আরবরা সিন্ধু আক্রমণ করে এদেশে ইসলামের যে ভিত রচনা করে যায়, তার উপরে ভর রেখে পরবর্তীকালে তুর্কীরা ইমারত গড়ে তুলেছিল। তিনি লিখেছেন ঃ *"The Arab conquest of Sind was destined to sow the seed of Islam in this land. ...It became the endeavour of future invadors from the north-west to help this religion expand and flourish..."* শ্রীবাস্তবের এই মূল্যায়নকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায়

Scanned by CamScanner

না। তবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সিন্ধুতে আরব-শাসনের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক একমত। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, ভারতবর্ষের সাথে সংযোগের ফলে বেশি উপকৃত হয়েছিল আরবের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মন্দির ইত্যাদি ভারতের বহু সুদৃশ্য ইমারত আরবদের সদম্ভ আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের নির্মিত দুর্গ ও প্রাসাদ কালের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু ভারতের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন থেকে তারা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। ভারতীয় সভ্যতার উন্নতমান তাদের অবাক করেছিল। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের জ্ঞানের গভীরতা বিস্মিত করেছিল নবাগত আরবদের। এখানে এসে তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে যে, ইসলামের মূল তত্ত্ব *'একেশ্বরবাদ'* হিন্দু-দর্শনে অজানা বা অস্বীকৃত নয়। আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকেই রাষ্ট্রশাসনের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়। তাই আরবদেশের প্রশাসনে তারা ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

ভারতীয় ভাস্করদের অমর সৃষ্টি দেখে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে আরবরা তাদের দেশে সসম্মানে নিয়ে যায় ভারতীয় শিল্পীদের। ভারতীয় পণ্ডিতদের পদতলে বসে দর্শন, ভেষজ, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রে তারা দক্ষতা অর্জন করে। খলিফা মনসুরের আমলে (৭৫৩-৭৭৪ খ্রীঃ) বাগদাদে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন বহু ভারতীয় পণ্ডিত। আরবীয় শিক্ষার্থীরাও ভারত থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন খলিফার আগ্রহে। তাঁরা এই সময় ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত *'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'* ও *'খণ্ড খাদ্যক'* নামক দুটি পুস্তক আরবে নিয়ে যান এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় সেগুলিকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেন। এখান থেকেই আরবগণ বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যার মূলতত্ত্ব শিক্ষালাভ করে। খলিফা হারুনের আমলে (৭৮৬-৮০৮ খ্রীঃ) এই যোগাযোগ আরও সম্প্রসারিত হয়। আরবীয় লেখকদের গ্রন্থে ভালা, মনাকা, বিজয়কর, সিন্দবাদ প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, মনাকা একবার এক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে খলিফা হারুনকে মুক্ত করেছিলেন। বাগদাদের একটি চিকিৎসালয়ে প্রধান চিকিৎসক হিসেবে ধন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বস্তুত, ইউরোপের ভাবজগৎ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান একদা বাগদাদের আলোকস্পর্শে আলোকিত হয়েছিল ; এবং একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, বাগদাদের এই গৌরবের মূল স্থপতি ছিল ভারতবর্ষ। **ঈশ্বরীপ্রসাদ** লিখেছেন : *"A great many elements of Arabian culture, which afterwards had such a profound effect upon European, civilization were borrowed from India."* আরবদেশের মাধ্যমে ভারতীয় সুপ্রাচীন ও সুমহান জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা ইউরোপে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাই অষ্টম ও নবম শতকে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তির আড়ালে ভারতের সাথে আরবদের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অধ্যাপক **শ্রীবাস্তব** লিখেছেন : *"much of the enlightenment of the early Europeans of the 8th and 9th centuries A. D., was therefore due to the Arab contact with India."* ঐতিহাসিক **হ্যাভেলও** স্বীকার করেছেন যে, ভারতের সাথে সংযোগের ফলে আরবীয় তথা ইউরোপীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি পুষ্ট হয়েছিল।

এই উজ্জ্বল চিত্রের অন্ধকারময় দিকটিও উল্লেখ্য। আরবগণ ভারতীয় দর্শন ইত্যাদির স্পর্শে সঞ্জীবিত হলেও, ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদিকে তারা কোনভাবে সাহায্য করেনি বা

Scanned by CamScanner

করতে চায়নি। তাই সেদেশের মহত্তর দিক, যা কিছু কিছু নিশ্চয় ছিল, এদেশের মাটিতে প্রচারিত হতে পারেনি। ঐতিহাসিক *সতীশচন্দ্র* মনে করেন, আরবদেশের শাসককুলের অনুদারতা এজন্য অবশ্যই দায়ী ছিল। তিনি আরও মনে করেন যে, আরবীয় পণ্ডিতেরা যেভাবে বাগদাদের সাহায্য, সমর্থন পেয়েছিলেন, ভারতীয় পণ্ডিতেরা ঠিক ততটা স্বাধীনতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। এটি অবশ্যই দুঃখজনক ঘটনা। তবে সান্ত্বনা এই যে, ভারতবর্ষ তার উদারতা ও আতিথেয়তা সুমহান ঐতিহ্য বহিরাগত আরবদের ক্ষেত্রেও উন্মুক্ত হাতে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি।

Scanned by CamScanner